শাশ্বত

শুভকর্মে শুভ মন্দে মন্দফল

প্রথম পর্ব

ভারতের ধর্ম এবং দর্শনের মেরুদণ্ড হল কর্মবাদ। যেমন প্রতিটা কাজের কারণ থাকে, তেমনি প্রতিটা কাজ কর্মফল প্রসব করে, এর কোনও অন্যথা হয় না। এক অলক্ষ্য নিয়মে এই কর্মচক্র চলছে জগতে, নিয়মটির নাম হল 'ঋত'। জীবনে চলার পথে নিয়মটা মনে রাখতে পারলে হালকা থাকা যায়।

আমরা জানি বা না জানি, আমাদের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু ঋণের বাঁধন। ঋণ মেটাতে আসি আমরা—একে বলে ঋণানুবন্ধ। কখনও বা অন্যের ঋণ শোধ হয় আমার প্রতি শুভ আচরণে। কখনও বা আমার প্রতি ঘটে যাওয়া কোনও দুঃসহ ঘটনার পেছনে থেকে যায় আমারই কোনও কর্মফল, আমার ভুলে যাওয়া কাজের কিছু ফল। পরিবারে কারও কাছে কষ্ট পেয়েছি? তার কাছে আমার ধার ছিল এককালে, কষ্ট দিয়েছিলাম তাকে—চুকে গেল আজ। ছেড়ে চলে গেল কোনও প্রাণের বন্ধু? ভেসে গেছে বাড়ি ঘরদোর? পুত্রটির অমানবিক ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত আমি? অকালমৃত্যু হল কন্যার?—জানি না কবে কোন দুষ্কর্মের পাহাড় জমিয়েছিলাম। আর যেন আমার ব্যবহারে দুঃখ পেয়ে কেউ চোখের জল না ফেলে, যেন 'আঃ' বলে না ওঠে মনে মনে—ওই আর্তনাদের মূল্য কিন্তু শোধ করতে হবে আমায় নিক্তি মেপে। হিসেবের খাতা কখনও ভুল কথা বলে না।

স্বামী রামশরণজীর ছোট একটি আশ্রম আছে চিত্রকূটে। এটি তাঁর গুরুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। শ্রীগুরুর কাছে তিনি এসেছিলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। তাঁর আশ্রয় ও শিক্ষায় অনেকগুলি বছর রামশরণের একান্ত সাধন-ভজনে কেটে গেছে। তাঁর হাতেই আশ্রমের সমস্ত ভার অর্পণ করে গুরুদেব বেশ কয়েকবছর হল মরদেহ ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে এই আশ্রমে রামশরণজী ছাড়াও থাকেন তাঁর চার শিষ্য। ছোট একটি মন্দির, তাতে আছে বালক রামলালার মূর্তি। নিত্য পূজা হয় মন্দিরে, সন্ধ্যায় ভজন-কীর্তন চলে কিছুক্ষণ।

একদিন আশ্রমে একটি দামি গাড়ি এসে থামল।

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

অধ্যক্ষা,
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন
বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। সুবেশ, সম্ভ্রান্ত মানুষটি রামশরণজীর সঙ্গে দেখা করতে চান। রামশরণজীর অনুমোদনে ভদ্রলোককে দর্শনের অনুমতি দেওয়া হল।

রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে কী কথা হল কে জানে, দরজা খোলার পর দেখা গেল ভদ্রলোকের প্রসন্ন উদ্ভাসিত মুখ—যেন কোনও মহা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন তিনি।

যাওয়ার আগে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি বললেন, ''গুরুজী, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি বলুন—আমায় আপনার যেকোনও ব্যক্তিগত সেবার অধিকার যদি দেন তাহলে আমি কৃতার্থ হব।"

ভদ্রলোক ধনী ব্যবসায়ী, অর্থের কোনও অভাব নেই। রামশরণজী বললেন, ''ঠিক আছে। আমার নিজের জন্য তো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আগামী মাসে কুম্ভমেলা, আমি প্রয়াগরাজে যাত্রা করছি। যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে সেখানে সহস্র সাধুর ভাণ্ডারা দিয়ো।"

ভদ্রলোক খুব খুশি হয়ে নিজের ঝোলা থেকে বহুমূল্য দুটি রত্ন বার করলেন। তিনি রত্ন ব্যবসায়ী। রামশরণজীর পায়ের কাছে রত্ন দুটি রেখে তিনি বললেন, ''বাবা, এই রত্ন দুটির মূল্য লক্ষ টাকার ওপরে। আপনি কোনও ধর্মশালার মালিককে এই রত্ন দুটি দিয়ে সাধু ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করতে বলবেন। তারা খুশি হয়ে আপনার কাজ করে দেবে। এত ছোট দুটি রত্নকে আপনি অনায়াসে অন্য জিনিসের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন। কোনও বিপদ হবে না।"

কিছুদিন পর শুভ দিনক্ষণ দেখে আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসী মহারাজ যাত্রা করলেন প্রয়াগরাজের উদ্দেশে। রত্ন দুটিকে একটি মলিন টিনের কৌটোতে রেখে, সেটিকে আবার ছোট থলিতে ভরে নিজের কোমরে বেঁধে নিলেন।

কখনও গাছতলায়, কখনও বা মঠ-মন্দিরের বারান্দায় রাত কাটে, আবার পথ চলেন। এভাবে এসে পৌঁছন এক লোকালয়ে। সন্ধ্যা হয়ে এল। খবর নিয়ে জানলেন রাত্রিবাসের মতো কোনও মন্দির নেই সেখানে, তবে কাছেই এক রত্ন ব্যবসায়ী থাকেন, তিনি বড় সাধুভক্ত। নাম তাঁর শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদী। সেই বাড়িতে সাধু রাত্রিবাস করতে পারেন। সত্যিই তাই, খুব আন্তরিকতায় সাধু মহাত্মাকে আহ্বান জানালেন চতুর্বেদীজী। অনেক কিছু রান্না করে খাওয়ালেন তাঁকে। কিছু সৎপ্রসঙ্গও হল। স্বামী-স্ত্রী পায়ের কাছে বসে মন দিয়ে সেসব আলোচনা শুনলেন আনন্দের সঙ্গে, আবার দুঃখের কথাও জানালেন যে বেশ কিছুবছর হল বিয়ে হয়েছে তাঁদের, কিন্তু কোনও সন্তান নেই, সাধুবাবা যেন আশীর্বাদ করেন। রাতে গৃহস্বামী তাঁকে পা টিপে দিতে এলেন ঘরে। এটাই তাঁদের পরিবারের রেওয়াজ। বহুদিন পরে একটি কোমল শয্যায় শয়ন করে, পর্যাপ্ত আহার করে রামশরণ স্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে পা টিপতে টিপতে শ্রীনারায়ণের চোখ পড়ল সাধুর বালিশের পাশে রাখা একটি থলির দিকে। এটি তো জপের মালা নয়! থলির মধ্যে বোঝা যাচ্ছে একটি কৌটো আছে। খুব কৌতূহল হল তাঁর। চুপিচুপি থলিটি তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। থলির মুখ খুলতেই বেরিয়ে এল একটি কৌটো। কৌটোর ঢাকনা খুলে তো রত্ন ব্যবসায়ীর মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। জহুরির চোখ এক নিমেষে চিনে নিল বহুমূল্য রত্ন দুটিকে। সাধু এসব নিয়ে করবেন কী? স্ত্রীকে ডাকলেন বণিক। লোভে চকচক করে উঠল দুজনের চোখ। তারপর রত্ন দুটি সরিয়ে ফেলে সমান ওজনের দুটি পাথরের টুকরো ভরে দিলেন কৌটোতে।

পরদিন সকালে সাধু লাঠি হাতে এবং কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন। যাওয়ার আগে

স্বামী-স্ত্রীকে আশীর্বাদ করলেন তিনি—''তোমরা এত যত্ন করেছ আমায়। আমি প্রয়াগসঙ্গমে যাচ্ছি কুম্ভমেলায়, সেখানে প্রার্থনা করব যাতে তোমাদের একটি সন্তান লাভ হয়।''

কুম্ভমেলা! সহস্র সহস্র মানুষের মিলনক্ষেত্র! বিশেষত ভারতের অধিকাংশ সাধুসন্তের মঠ-আখড়া থেকে এসেছেন বহু মহাত্মা। সন্ন্যাসী এক বড় ধর্মশালায় ওঠেন এবং ধর্মশালার মালিককে তাঁর সদ্‌বাসনার কথা জানান। তিনি সহস্র সন্ন্যাসীকে খাওয়াতে চান, ধর্মশালার মালিক যেন সকলকে নিমন্ত্রণ জানান। তিনি যে-অর্থ দেবেন তাতে এই সাধুভোজনের পরেও বেশ কিছু অর্থ থাকবে। সেই অর্থ ভাগ করে যেন সাধুদের দক্ষিণা হিসাবে দেওয়া হয়।

ধর্মশালার মালিক তো খুব খুশি! প্রচুর লাভ হতে চলেছে তাঁর কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে। বিকেল হতে না হতেই চললেন আনাজপাতি কিনতে। নিমন্ত্রণও জানালেন সাধুদলের কাছে গিয়ে গিয়ে। পরদিন মালিক এসে জানালেন রান্না শেষ, কিন্তু মিষ্টান্নাদি কেনার পয়সা চাই। অত খরচ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবারে সাধু দোকানির হাতে কৌটোটি তুলে দিয়ে বললেন, ''দ্যাখো এর মধ্যে বহুমূল্যবান দুটি রত্ন আছে। তুমি এখনই কোনও রত্নব্যবসায়ীর কাছে যাও। যে-টাকা তুমি পাবে তাতে এই ধর্মশালা নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে পারবে।''

খুব খুশি হয়ে সাবধানে ঘরের দরজা বন্ধ করে থলি এবং কৌটোর মুখ খুললেন ধর্মশালার মালিক। কিন্তু এ কী! দুটি পাথরের টুকরো! হায় হায় করতে করতে ছুটলেন সাধুর কাছে—''এতবড় ঠগ, জোচ্চোর তুই, সাধুর বেশ ধরে পুণ্য কামাবার জন্য আমার ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছিস? আমায় সর্বস্বান্ত করে তোর কী লাভ বল? কী পুণ্য হবে তোর? দূর হ, দূর হ আমার ধর্মশালা থেকে!'' —অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে থাকেন তিনি সাধুকে। সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ! কোথায় রেখেছিলেন থলিটি অসতর্কতায়? কে এমন দুর্বুদ্ধি করে তাঁর কৌটোতে পাথর ভরে দিল? হঠাৎ মনে পড়ল সেই ব্যবসায়ীর বাড়ির কথা। একমাত্র ওখানেই তিনি পরম তৃপ্তিতে গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিলেন।

মান-অপমানে নির্বিকার থাকা তাঁর কর্তব্য। ধর্মশালার মালিকের দেওয়া 'জোচ্চোর' অপবাদ তিনি হজম করার চেষ্টা করলেন। ধীরে ধীরে ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন সঙ্গমের দিকে। কী পাপ করেছেন তিনি? সাধু হয়ে ধন সঙ্গে রেখেছিলেন, এটাই অপরাধ? কিন্তু নিজের জন্য তো কিছু রাখতে চাননি, নিরালম্ব হয়েই জীবন কাটাচ্ছিলেন, সেভাবেই দিন কেটে যেত। শুধু কিছু পুণ্যাত্মাকে খাওয়াতে চেয়েছিলেন এবং অন্য এক পুণ্যার্থীকে সেই পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। এ-মুখ তিনি দেখাবেন কী করে? কত সাধুসন্ত এখনই এসে দাঁড়াবেন ধর্মশালায়। গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ান সন্ন্যাসী। সহস্রধারায় চোখের জল ঝরে পড়ে। ''মা গঙ্গা, তুমি জানো আমার কতটুকু অপরাধ! জানি না কোন কর্মের ফল ভোগ করছি। কিন্তু আমার এই দুর্গতির প্রতিবিধান কোরো তুমি।'' গঙ্গায় নামেন সাধু। ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকেন, আর ওঠেন না।

দ্বিতীয় পর্ব

এদিকে সেই চতুর্বেদীর ব্যবসা সাধুর কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া সম্পদে আরও ফুলেফেঁপে ওঠে। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ব্যর্থ হল না, কিছুদিনের মধ্যেই একটি ফুটফুটে ছেলে হল তাঁদের। বহুদিন পরের সন্তান, বাবা-মার নয়নের মণি। আর ছেলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদ আরও যেন উথলে উঠল। খুব লাভ হতে থাকল ব্যবসায়। ছেলের নাম রাখলেন সুরজ। বড় হয় ছেলে। সূর্যের দীপ্তির মতোই রূপে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয় হয়ে

ওঠে সে। তাকে দেখে দেখে বাবা-মার বুক গর্বে ভরে যায়। তাঁদের বাড়িতে বিদ্যার চর্চা নেই, কিন্তু এই ছেলে বিদ্যালয়ের অসম্ভব কৃতী ছাত্র। স্কুলের গণ্ডি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সুরজ উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হল কলেজে। বিজ্ঞান নিয়ে সে পড়াশোনা করছে। এখানেও অধ্যাপকেরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপর ভরসা করেন। ব্যবসায়ী স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন, ''ছেলেকে আর এই ছোটখাট ব্যবসায় ঢোকাব না আমরা। বিলেত পাঠাব পড়ালেখা করার জন্য। ভগবানের দয়ায় সেই ক্ষমতা তো এখন আমাদের আছে।''

একদিন সুরজ ঘরে ফেরে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। ব্যথা যদিও বা কমে, ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যেতে থাকে সে। কত ডাক্তার-বদ্যি, কত মানত-কবচ-তাবিজ—ছেলের রোগ আর সারে না। তার চিকিৎসায় জলের মতো অর্থব্যয় হতে থাকে। অবশেষে ব্যবসার অংশ বিক্রি করতে শুরু করলেন শ্রীনারায়ণ। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যাঙ্কের টাকা শেষ হয়ে যায়। ব্যবসাতেও লগ্নি করার মতো টাকা ফুরোয়। তবু আশায় বুক বেঁধে খরচ করতে থাকেন ছেলের জন্য। ছেলে বাঁচলে আবার সব হবে।

একদিন অসহায় হয়ে ছেলের রোগশয্যায় শিয়রে বসে দেখছেন স্বামী-স্ত্রী যে, নাড়িছেঁড়া বুকের ধন—এমন সুপুত্ররত্ন তাঁদের—একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে বিছানায়। সেসময় সুরজ হঠাৎ বলে ওঠে, ''বাবা, খুব ইচ্ছে করছে একটু তীর্থরাজ প্রয়াগে যাব। একশো চুয়াল্লিশ বছর পর তীর্থরাজে মহাকুম্ভ হতে চলেছে, আমায় সেখানে নিয়ে যাবে? আমার এক হাজার সাধুসন্তকে খাওয়ানোর বড় ইচ্ছা।'' শ্রীনারায়ণ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে হতাশ হয়ে বলেন, ''তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তো আমি সব দিতে পারি বাবা, কিন্তু ধনসম্পত্তি যে আর আমার নেই।'' ''তোমার বসতবাড়িটা তো আছে, সেটা বিক্রি করলে মনে হয় যথেষ্ট টাকা পেয়ে যাবে। সাধুদের খাওয়ানো পুণ্যের কাজ। পরে আবার ব্যবসা করে তুমি টাকা জোগাড় করে নিয়ো।'' ছেলের ইচ্ছা, যদি সাধু-মহাত্মাদের আশীর্বাদে ছেলে বাঁচে—ব্যবসায়ী সত্যি সত্যিই বাড়িঘরদোর বিক্রি করে সস্ত্রীক, সপুত্র চললেন প্রয়াগে।

কুম্ভমেলা শুরু হয়েছে। কত সাধুসন্তের মেলা সেখানে। রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে বড় তীর্থাবাসে ওঠার ক্ষমতা নেই ব্যবসায়ীর। একটি বড়মাপের ধর্মশালা খুঁজে নিলেন তিনি। ধর্মশালার মালিককে তাঁর সদিচ্ছার কথা জানালেন—হাজার সন্তের ভোগ লাগাতে চান—যা অর্থ লাগে দেওয়া যাবে। শুনেই জ্বলে ওঠেন মালিক। ''আবার? গতবারের পূর্ণকুম্ভে এক জোচ্চোর সাধুর বেশ ধরে এসে আমার কত ক্ষতি করে গেছে। আর্থিক ক্ষতি তো হয়েইছে—সবচেয়ে বড় হল বেইজ্জতি। এত সাধুসন্ত এসে নামমাত্র খেয়ে ফিরে গেলেন। রাম, রাম—আমি ছোটখাট ধর্মশালা চালাই—আমার দ্বারা একাজ হবে না।'' অবাক হন ব্যবসায়ী, ''আমি তো ভাই অগ্রিম টাকা দেব। অসুবিধা কী?'' ধর্মশালার মালিক একটু শান্ত হন। ''আমি সব কিন্তু অগ্রিম টাকা নিয়ে কিনব। আজ থেকে কত বছর আগের কথা। এর আগে যেবার পূর্ণকুম্ভ হল প্রয়াগে, সেবারে এক সাধু এসেছিল আমার ধর্মশালায়, সেও চেয়েছিল হাজার সাধুকে খাওয়াতে। আমি আনন্দে সব কেনাকাটা করি নিজের টাকায়। ভাবি সাধু কি আর ঠকাবে? ওমা! সাধু পরে একটা থলি দিয়ে বলে, এর মধ্যে রত্ন আছে। আমি তো খুলে বোকা বনে গেলাম। কোথায় রত্ন! দুখানা পাথরের টুকরো। আমায় ঠকিয়ে ফাঁকতালে সাধুবাবা পুণ্য কামাতে চেয়েছিল।''

ব্যবসায়ীর হাতের তালু ঘেমে ওঠে, জিভ শুকিয়ে যায়। ''তারপর কী হল সেই সাধুর?'' ''কী আর হবে, লজ্জায় পড়ে গঙ্গায় ডুবে মরেছিল।

তিনদিন পরে সঙ্গমের ঘাটে লাশটাকে আটকে থাকতে দেখেছিল সবাই।" কথা বলতে বলতে বিরক্তমুখে চলে যান ধর্মশালার অধিকারী। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে। আজ রাতে কিছুতেই চোখের কোণ দুটো শুকোতে চায় না ব্যবসায়ীর। ঘুমও হয় না।

পরদিন হাজার সাধুর জয়জয়কারে ভাণ্ডারা সম্পন্ন হল। ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন সবাই। ছেলেটি একটি খাটিয়ায় শুয়ে দুচোখ ভরা তৃপ্তিতে সেই সাধুভোজন দেখতে থাকে। ক্রমে সব কাজ শেষ হয়, সন্ধ্যা নামে আর তখনই সুরজের অসম্ভব শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অজানা অপরিচিত জায়গায় ছুটোছুটি করতে থাকেন শ্রীনারায়ণ। এত ভিড়, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে ছেলেকে, অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করবেন কী করে? ধর্মশালার মালিকও খবর করতে শুরু করলেন। এসময় সুরজ কোনওমতে হাতের ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল যে সে সঙ্গমে যেতে চায়। বাবা-মা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অসুস্থ ছেলেকে টাঙায় শুইয়ে নিয়ে চললেন সঙ্গমে, ওখানেই ডাক্তারও পেয়ে যাবেন হয়তো। সঙ্গে চললেন সেই ধর্মশালার মালিক।

অন্ধকার নেমে আসছে। গঙ্গার তীরে ধরে ধরে নামালেন ছেলেকে। ইশারায় তাকে বালির শয্যায় শুইয়ে দিতে বলল সুরজ। মা-বাবা যেন কোনও ঘোরের মধ্যে আছেন। তাঁরা ধরে ধরে ছেলেকে নদীর তীরে শুইয়ে দিলেন। এবারে পূর্ণদৃষ্টিতে বাবা-মার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল সুরজ—"বড় অন্যায় করেছিলে। এক নিরপরাধ সন্ন্যাসীর চোর অপবাদ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে গিয়েছিল তোমাদের অপরিসীম লোভে। সন্ন্যাসীর টাকা অপহরণ করতে তোমাদের হাত কাঁপেনি সেদিন। আমিই সেই সন্ন্যাসী রামশরণ, তোমাদের পুত্র হয়ে জন্মেছিলাম। আমার কোনও পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল আমি ভোগ করে গেলাম। যতই হোক, এ-জন্মে তোমরা আমার বাবা-মা। তাই তোমাদের কল্যাণের জন্য বলছি, যে-কদিন বেঁচে থাকবে ভগবানকে ডাকো একমনে আর নীরবে নিঃশব্দে চোখের জলে সন্তানের বিয়োগব্যথা আর দারিদ্র্য সহ্য করে যাও। নইলে তোমাদের এই অপকর্মের ভয়ানক ফল আরও বহুজন্ম ভুগতে হবে।"

স্পষ্ট গলায় কথা কটি বলে চোখ বন্ধ করল সুরজ।

ভীতচকিত ধর্মশালার মালিক সব শুনতে শুনতে যুবক সুরজের পা চেপে ধরে। কিন্তু ততক্ষণে সন্ন্যাসী স্বামী রামশরণ—শ্রীনারায়ণ চতুর্বেদীর পুত্র সুরজ চতুর্বেদী, লোভী ব্যবসায়ী এবং তাঁর স্ত্রীকে কর্মফলের ঋণ থেকে কিছুটা মুক্ত করে দিয়ে নিশ্চিন্তে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাধুসেবা করার অভ্যাস ছিল সস্ত্রীক চতুর্বেদীর, সেই পুণ্যে খুব তাড়াতাড়ি তাদের পাপক্ষয় হতে শুরু করেছিল।

দেনাপাওনার হিসেব মেটাতেই আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পথ চলা। যা দেনা জমিয়েছি তা তো শুধতেই হবে। তবে যেন নতুন করে কোনও ধারদেনা না করে বসি—মানুষকে কষ্ট না দিই। যেকোনওভাবে পাওয়া আঘাতকে সয়ে নিতে পারি এই ভেবে যে, এই ঋণানুবন্ধকে মিটিয়ে দিলে আমারই লাভ। এর প্রতিক্রিয়ায় রাগ-অভিমান-দুঃখ আমারই ক্ষতি করবে। অন্যদিকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদের মতো ছুটে চলাকে যদি থামাতে পারি, তাহলে আর নতুন কর্মফল জমবে না। আর এসবই সম্ভব হবে সহজে, যদি ভগবানকে ধরে থাকতে পারি সুখে-দুঃখে। ✠